আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়

গবেষণা সিরিজ-৮

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1366-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১
নবম সংস্করণ : জুন ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ	২৪
৬	আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তির কারণ	২৭
৭	সাহাবী যুগে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের অবস্থা যা ছিল	
	ক. রসূল স. উপস্থিত থাকা পর্যন্ত সাহাবী যুগের সময়কাল	
	খ. রসূল স.-এর এন্তেকালের পরের সাহাবী যুগের সময়কাল	২৯
৮	সাহাবী যুগে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নির্ণয়ে যে সকল কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল	৩০
৯	সাহাবায়ে কিরামের পরের যুগে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের অবস্থা যা হয়	৩৪
১০	আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগের যে বিশাল দুর্বলতা অতি সহজে ধরা যায়	৩৫
১১	আমলের শ্রেণিবিভাগ নির্ণয়ের প্রচলিত নীতিমালার দুর্বলতা বিভিন্ন ধরনের আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে	৩৬
	১. ফরজ আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে	
	২. ওয়াজিব আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে	
	৩. সুন্নাত আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে	৩৭
১২	আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তির মূল কারণ	৩৮

১৩	যে দুটি বিষয় জানা থাকলে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করা সহজ হবে	৩৯
	ক. বিষয়বস্তুর আলোকে কুরআনে উল্লিখিত বিষয়সমূহের শ্রেণিবিভাগ	
	খ. হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	৪২
১৪	ইসলামী আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করার সহজতম উপায়	৪৬
	▪ Common sense	
	▪ কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস)	৪৮
১৫	মৌলিক আমলের তালিকা জানার সহজতম উপায়	৪৯
	▪ Common sense	
	▪ আল কুরআন	৫০
	▪ আল হাদীস	৫৫
১৬	কুরআন থেকে মৌলিক করণীয় (ফরজ) আমল খুঁজে বের করার পদ্ধতিসমূহ	৬৫
১৭	কুরআন থেকে মৌলিক নিষিদ্ধ (হারাম) কাজ খুঁজে বের করার পদ্ধতিসমূহ	৬৮
১৮	অমৌলিক করণীয় (মুস্তাহাব) ও নিষিদ্ধ (মাকরূহ) আমলের তালিকা জানার উপায়	৭২
১৯	শেষ কথা	৭৫

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

যেকোনো ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সফল হতে হলে ঐ কর্মকাণ্ডের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান হলো– একটি কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহের একটিও বাদ দিলে কর্মকাণ্ডটি আংশিক নয়, বরং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। জীবন পরিচালনা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে ইসলামের মৌলিক আমলের একটিও বাদ দেওয়া যাবে না। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দিকে তাকালে সহজেই দেখা যায় তাদের অধিকাংশই অনেক মৌলিক আমল ছেড়ে দিচ্ছেন এবং অনেক অমৌলিক আমল নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন। সহজেই বলা যায়– এতে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুসলিমদের দুনিয়ার ব্যর্থতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পরকালের ব্যর্থতা সেখানে পৌঁছালে অবশ্যই দেখা যাবে। মুসলিমদের আমলের এ বিপর্যয়ের একটি প্রধান কারণ হলো- ইসলামের মৌলিক আমলের নির্ভুল তালিকা জানার সহজতম উপায়টি জাতির সামনে উপস্থিত না থাকা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুস্তিকাটি জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান করে দুনিয়া ও আখিরাতে বিপুল কল্যাণ বয়ে আনবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

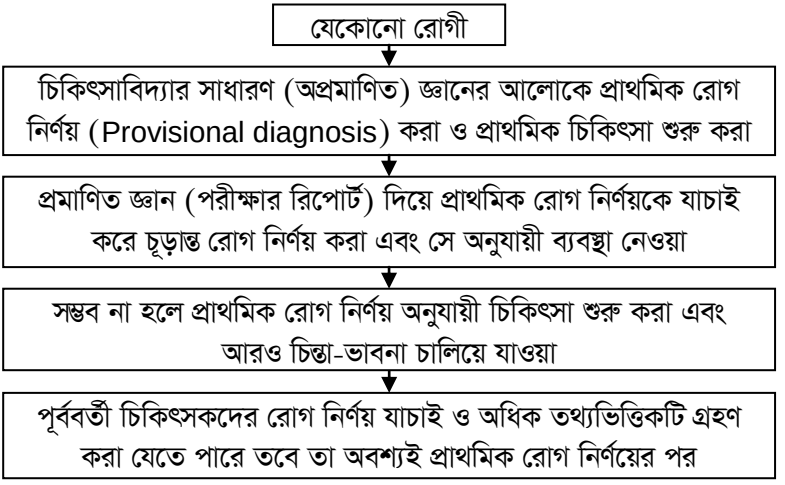

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

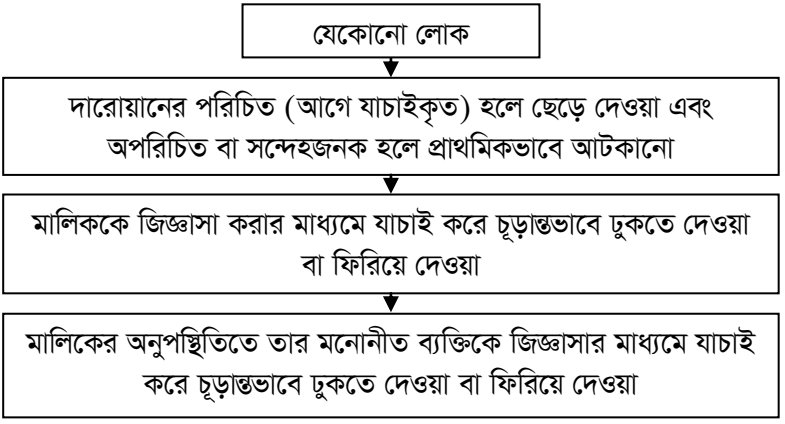

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

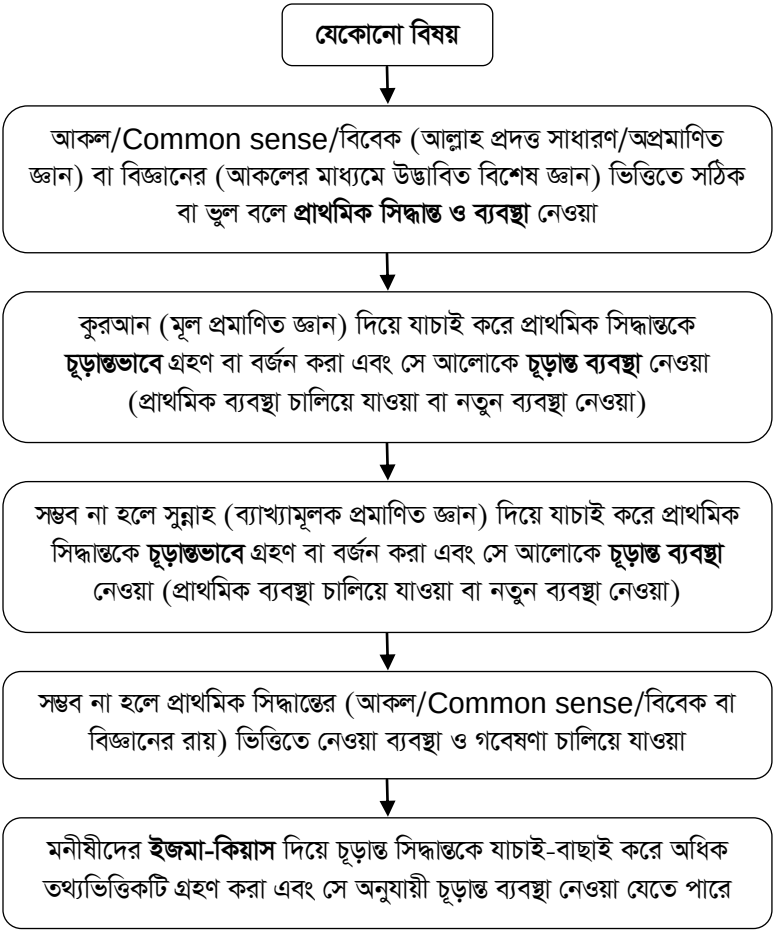

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

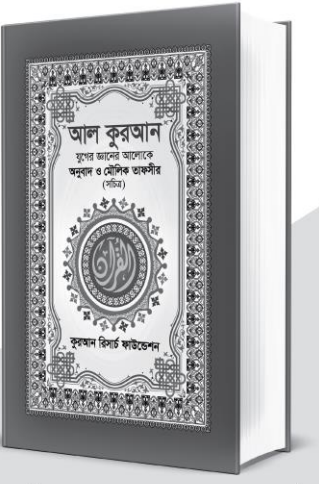

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের ইসলাম অনুসরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– অধিকাংশ মুসলিম ইসলামের অনেক মৌলিক আমল ছেড়ে দিচ্ছেন এবং অমৌলিক আমল নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন। Common sense-এর আলোকে সহজেই বলা যায় উপরিউক্তভাবে ইসলাম পালিত হলে যেকোনো মুসলিমের উভয় জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুসলিমদের আমলের এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হলো– কোনগুলো ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক আমল তা অধিকাংশের জ্ঞানের বাইরে থাকা। আর এটির প্রধান কারণ হলো– ইসলামের মৌলিক আমলের নির্ভুল তালিকা জানার সহজতম উপায়টি জাতির সামনে উপস্থিত না থাকা।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক আমলের নির্ভুল তালিকা জানার সহজতম উপায়টি জাতির সামনে উপস্থাপন করা। এর সাহায্যে মুসলিমগণ সহজে জানতে বা আলাদা করতে পারবেন কোনগুলো ইসলামের মৌলিক আমল এবং কোনগুলো অমৌলিক আমল। আর এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

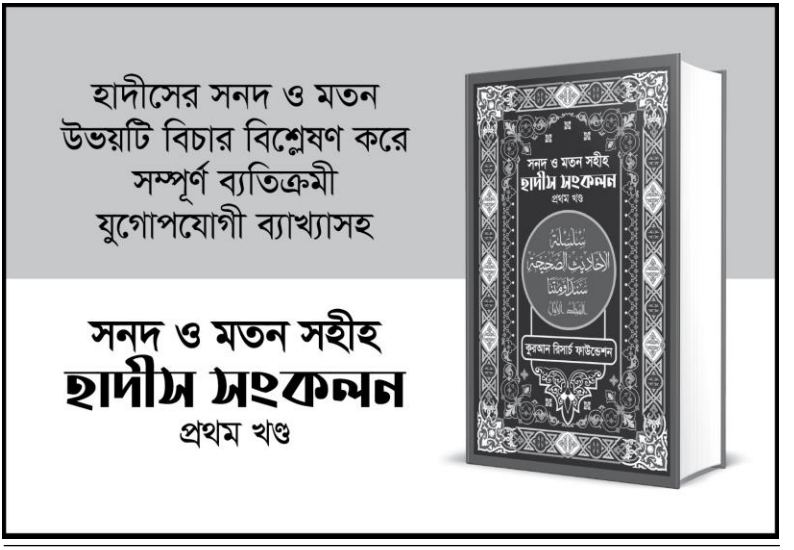

আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ

ইসলামী আমলের গুরুত্বের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ (ফকীহগণ) নানা দলে বিভক্ত। বিভিন্ন দলের উপস্থাপন করা শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ–

একদল বিশেষজ্ঞের করা শ্রেণিবিভাগ

ক. করণীয় আমল

এ দলের ফকীহরা সুন্নাহ তথা রসূল স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন পর্যালোচনা করে গুরুত্বের ভিত্তিতে ইসলামের করণীয় আমলসমূহকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন–

১. **ফরজ :** ফরজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বাধ্যতামূলক বা অবশ্য করণীয়। এ দলের ফকীহগণ সুন্নাহ পর্যালোচনা করে গুরুত্বের দিক দিয়ে যে আমলকে প্রথম অবস্থানে মনে করেছেন তার নাম দিয়েছেন ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় বা বাধ্যতামূলক আমল। এ দলের মতে- ফরজ অস্বীকারকারী কাফির। আর ফরজ আমল ত্যাগ করা বড়ো (কবীরা) গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২. **ওয়াজিব :** এ দলের ফকীহরা সুন্নাহ পর্যালোচনা করে গুরুত্বের দিক দিয়ে যে আমলগুলোকে দ্বিতীয় অবস্থানে মনে করেছেন তার নাম দিয়েছেন ওয়াজিব। এ দলের মতে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কেউ কাফির হয় না। তবে ওয়াজিব ত্যাগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ।

৩. **সুন্নাত :** এ দলের ফকীহরা গুরুত্বের দিক দিয়ে রসূল স.-এর পালন করা যে আমলগুলোকে তৃতীয় অবস্থানে মনে করেছেন তার নাম দিয়েছেন সুন্নাত। এ দলের মতে সুন্নাত আমল অস্বীকার করলে কেউ কাফির হবে না। সুন্নাত আমল দু'প্রকার : মুয়াক্কাদাহ এবং গায়রে মুয়াক্কাদাহ।

যে আমলগুলো রসূল স. প্রায় সময় করেছেন এবং কখনও কখনও ছেড়ে দিয়েছেন তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। তবে যারা তা করেননি, তাদেরকে তিনি সতর্কও করেননি। এ ধরনের আমল ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করা গুনাহ। তবে এটি অস্বীকার করলে কাফির হয় না।

যে কাজগুলো রসূল স. কখনও করেছেন আবার কখনও ছেড়েও দিয়েছেন তাকে সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। এ সুন্নাত আমলগুলো করলে সওয়াব হয়, না করলে গুনাহ হয় না। আর এটি অস্বীকার করলে কেউ কাফির হয় না।

৪. **নফল :** এ দলের ফকীহরা সুন্নাহ পর্যালোচনা করে গুরুত্বের দিক দিয়ে যে আমলগুলোকে চতুর্থ অবস্থানে মনে করেছেন তার নাম দিয়েছেন নফল। এ দলের মতে- নফল আমল হচ্ছে সে আমলগুলো যা রসূল স. মাঝে মাঝে করেছেন তবে অধিকাংশ সময় ছেড়ে দিয়েছেন। এ আমল করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ নেই। আর অস্বীকার করলেও কাফির হবে না।

খ. নিষিদ্ধ আমল

এ দলের ফকীহরা সুন্নাহ পর্যালোচনা করে গুরুত্বের ভিত্তিতে ইসলামের নিষিদ্ধ আমলসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন–

১. **হারাম :** ফকীহগণ গুরুত্বের দিক দিয়ে যেগুলোকে প্রথম অবস্থানে মনে করেছেন তার নাম দিয়েছেন হারাম। এ দলের মতে- হারাম অস্বীকারকারী কাফির। আর হারাম বিষয় পালন করা বড়ো (কবীরা) গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২. **মাকরূহে তাহরীমি :** ফকীহগণ গুরুত্বের দিক দিয়ে যে আমলগুলোকে দ্বিতীয় অবস্থানে মনে করেছেন তার নাম দিয়েছেন মাকরূহে তাহরীমি। মাকরূহে তাহরীমি অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। তবে এ ধরনের কাজ করলে গুনাহগার হতে হবে।

৩. **মাকরূহে তানযীহি :** গুরুত্বের দিক দিয়ে ফকীহগণ যে আমলগুলোকে তৃতীয় অবস্থানে মনে করেছেন সেগুলোর নাম দিয়েছেন মাকরুহে তানযীহি। এ দলের মতে– মাকরূহে তানযীহি অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। তবে মাকরূহে তানযীহি থেকে দূরে থাকলে সওয়াব হবে, কিন্তু পালন করলে গুনাহগার হবে না।

{আসান ফেকাহ (ইউসুফ ইসলাহী, আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৪, ১ম খণ্ড) ও হাশিয়াতুল 'আনওয়া'ঈ (মুহাম্মাদ আল-বুকা'ঈ, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১২ হি., খ. ১, পৃ. ৩৫-৪০)-এর আলোকে}

দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ দলের করা শ্রেণিবিভাগ

ক. করণীয় আমল

দ্বিতীয় দলের ফকীহরা ইসলামের করণীয় আমলসমূহকে রসূল স.-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে গুরুত্বানুযায়ী প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করেছেন– ফরজ ও নফল।

১. **ফরজ :** এ দলের মতে ফরজ বিষয়গুলো হলো আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ যা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এগুলো পালন না করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, সত্য কথা বলা, আমানাত রক্ষা করা, ওয়াদা পূরণ করা, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা, উত্তরাধিকার বণ্টন করা, ওজনে কম না দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে বাধা দেওয়া ইত্যাদি।

২. **নফল :** এ দলের ফকীহগণ ফরজের বাইরে সকল আমলকে নফল নাম দিয়েছেন। আর নফল আমলগুলোকে সুন্নাহর ভিত্তিতে, গুরুত্ব অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছেন– ক. ওয়াজিব, খ. সুন্নত ও গ. মুস্তাহাব।

ক. ওয়াজিব : এ দলের মতে ওয়াজিব হলো করণীয় বা কর্তব্য। এগুলো হলো সেইসব নফল আমল যা ফরজ নয় তবে রসূল স. তা পালন করতে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। যেমন- বিতর সালাত, দুই ঈদের সালাত, কুরবানী, জামাতে সালাত পড়া, মজলুমকে সাহায্য করা, সালামের জবাব দেওয়া, সাদাকাতুল ফিতর দেওয়া, দাওয়াত কবুল করা ইত্যাদি।

খ. সুন্নত : এ দলের মতে সুন্নত হলো সেসব আচার-আচরণ ও ইবাদাত-বন্দেগী যেগুলো পালন করা রসূল স. তাঁর নিয়মে পরিণত করেছিলেন এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যা কল্যাণকর। যেমন– ফরজ সালাতের আগে-পরে ১০/১২ রাকাত সালাত পড়া, দান-সাদাকাহ করা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, আশুরার দিন রোযা রাখা, বিয়ে করা, মৃতের দাফন করা, হাসিমুখে কথা বলা, বিপদে সাহায্য করা, আতিথেয়তা করা, কর্জে হাসানাহ দেওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, মসজিদ নির্মাণ করা ইত্যাদি।

গ. মুস্তাহাব : এ দলের মতে মুস্তাহাব হলো সেইসব আচার-আচরণ ও ইবাদাত-বন্দেগী যেগুলো পালন করা রসূল স. নিয়মে পরিণত করেননি তবে কখনো কখনো করেছেন। নিয়মিত না করলেও কিছু বলেননি। যেমন– সুযোগ পেলে সালাত আদায় করা, মাঝে মাঝে রোজা থাকা, দান করা, ওমরাহ করা।

তৃতীয় বিশেষজ্ঞ দলের করা শ্রেণিবিভাগ

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে, শরীয়াতের হুকুম দুই প্রকার। যথা : ফরজ ও ওয়াজিব। (মুহা. আল-বুকা'ঈ, হাশিয়াতুল 'আনওয়া'ঈ, খ.১, পৃ.৩৬)

আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তির কারণ

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, গুরুত্বের ভিত্তিতে ইসলামী আমলের শ্রেণিবিভাগের বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে বড়ো ধরনের বিভক্তি রয়েছে। ইসলামী জ্ঞানের প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তাহলে ফকীহগণের মধ্যে এ বিভক্তির কারণ কী? বিষয়টির ব্যাপারে বিখ্যাত মনীষী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ.-এর 'আল ইনসাফ ফি বয়ানী আসবাবিল ইখতিলাফ' (মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়) নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য একটু গুছিয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সাহাবী যুগে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের অবস্থা যা ছিল

ক. রসূল স. উপস্থিত থাকা পর্যন্ত সাহাবী যুগের সময়কাল

রসূল স. যখন কোনো আমল করতেন সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তাঁরা রসূল স.-এর করা নিয়মে ঐ আমলটি পালন করতেন। সাধারণত এটাই ছিলো রসূল স.-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি। যেমন–

- রসূল স. ওজু করতেন। সাহাবায়ে কিরাম তা দেখতেন তিনি কী নিয়মে ওজু করেছেন। কিন্তু রসূল স. বিশ্লেষণ করে এভাবে বলে দিতেন না যে, এটি ওজুর ফরজ, এটি ওয়াজিব বা এটি ওজুর আদব।
- রসূল স. সালাত আদায় করতেন, সাহাবায়ে কিরাম তা দেখতেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম ঐ দেখা নিয়ম অনুযায়ী সালাত আদায় করতেন।
- তিনি হাজ্জ পালন করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর হাজ্জ পালন পদ্ধতি দেখে সে অনুযায়ী হাজ্জ পালন করতেন।

এ বিষয়টির সমর্থনে হাদীস–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . . . . . حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ – وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

ইমাম বুখারী রহ. মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন- মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী স.-এর কাছে হাযির হলাম। বিশদিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। আল্লাহর রসূল স. অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। অতঃপর তিনি বললেন– তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো। আর তাদের শিক্ষা দাও, এবং (দ্বীনের) আদেশমূলক (মৌলিক) বিষয়গুলো শেখাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক রা. আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। অতঃপর নবী স. বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং যে ব্যক্তি বয়সে বড়ো সে যেন ইমামতি করে।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

রসূল স. সাধারণত সাহাবীদের সাধারণ সভায় দ্বীনি কথাবার্তা বলতেন এবং শিক্ষা দিতেন। একজন সাহাবী–

- রসূল স.-কে যেভাবে ইবাদাত করতে দেখতেন এবং তাঁর থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফয়সালা শুনতেন, সেভাবেই তা আয়ত্ত করে নিতেন এবং আমল করতে থাকতেন।

- অতঃপর পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অবস্থা বিচার করে রসূল স.-এর ঐ সব বক্তব্য বা আমলের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করে নিতেন।
- এভাবে তারা কোনো হুকুমকে মুবাহ হিসেবে, আবার কোনো হুকুমকে মুস্তাহাব হিসেবে নির্ণয় করতেন।
- এসব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম দার্শনিক দলিল প্রমাণ অবলম্বন করতেন না। তাঁরা অবলম্বন করতেন তাঁদের মনের প্রশান্তি, প্রসন্নতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে।

খ. রসূল স.-এর এন্তেকালের পর সাহাবী যুগের সময়কাল

রসূল স.-এর যুগ পর্যন্ত উপরিউক্ত নিয়মে সাহাবায়ে কিরাম আমল করতেন। অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। যে যেখানে গিয়েছেন সেখানেই নেতৃত্ব লাভ করেছেন। এ সময়ে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যাবলি তাঁদের সামনে আসতে থাকে এবং লোকেরা ঐ সব বিষয়ে তাঁদের কাছে ফতোয়া ও ফয়সালা চাইতে থাকে। প্রত্যেক সাহাবী নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ সব ব্যাপারে ফতোয়া ও ফয়সালা দিতেন–

১. প্রত্যেক সাহাবী তাঁর জানা প্রমাণিত জ্ঞানের (কুরআন ও সুন্নাহ) আলোকে জবাব দিতেন।

২. ঐভাবে যদি সমাধান না পাওয়া যেত তবে তাঁরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা হলো–
   - রসূল স.-এর দেওয়া যে সকল বিধান বা ফয়সালা তিনি জানতেন সেগুলো কী কারণ বা উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতেন। অতঃপর তাঁর কাছে জানতে চাওয়া প্রশ্নটির কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে রসূল স.-এর দেওয়া যে ফয়সালার কারণ ও উদ্দেশ্যের মিল দেখতে পেতেন সেটিতে তাঁরা রসূল স. দেওয়া ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালা বা বিধান দিয়ে দিতেন।
   - পূর্ণ তাকওয়া ও ঈমানদারীর সঙ্গে তাঁরা ঐ কাজটি করতেন।

তাই সাহাবায়ে কিরামের যুগেই সুন্নাহ জানা, বিভিন্ন সুন্নাহর গুরুত্ব নির্ধারণ করা এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নির্ণয়ে বিভিন্নতা বা মতপার্থক্য শুরু হয়েছিল।

সাহাবী যুগে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নির্ণয়ে যে সকল কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল

১. রসূল স.-এর সুন্নাহ জানা থাকা না থাকার পার্থক্য

এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রধান কারণ। সকল সাহাবী রসূল স.-এর সকল সুন্নাহ জানতেন না। আর তা জানা সম্ভবও ছিল না। তাই যে সাহাবীর, তার কাছে আসা কোনো একটা প্রশ্ন বা সমস্যা সম্বন্ধে রসূল স.-এর বক্তব্য জানা থাকতো না সে বিষয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ (কুরআন বা হাদীসের অন্য তথ্যের আলোকে নিজ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করতেন। পরবর্তীতে এরূপ ইজতিহাদের যে অবস্থা হতো তা হচ্ছে–

- কখনো এরূপ ইজতিহাদ রাসূলের হাদীসের অনুরূপ হয়ে যেত।
- কখনো একটি মাসআলা সম্বন্ধে দু'জন সাহাবীর মধ্যে আলোচনা হতো। এ আলোচনায় কোনো সহীহ হাদীস তাঁদের সামনে এসে গেলে মুজতাহিদ তাঁর ইজতেহাদ পরিত্যাগ করে হাদীসটি গ্রহণ করতেন।
- কখনো এমন হতো যে, ইজতিহাদকারী সাহাবীর কাছে হাদীস পৌঁছেছে বটে কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য পন্থায় পৌঁছায়নি। এমন অবস্থায় মুজতাহিদ বর্ণনাটি পরিত্যাগ করতেন এবং নিজের ইজতিহাদের ওপর আমল করতেন।
- কখনো এমনও এমন হতো যে, মুজতাহিদ সাহাবীর কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসই পৌঁছেনি। ফলে তাঁর ইজতেহাদ হাদীসে রসূল স.-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হলেও তার ওপর তিনি আমল করে যেতেন।

২. রসূল স.-এর কাজের গুরুত্ব নির্ণয়ের পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এটি। সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম স.-কে একটি কাজ করতে দেখতেন কিন্তু

তাদের বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষগত পার্থক্যের কারণে কাজটির গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতো। ফলে কেউ রসূল স.-এর উক্ত কাজটিকে মনে করেছেন গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে। আর কেউ তাকে মনে করেছেন মুবাহ অর্থাৎ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উদাহরণ স্বরূপ হজ্বের সময় রসূল স.-এর আবতাহ উপত্যকায় অবতরণের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। আবু হুরায়রা রা. ও আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা.-এর দৃষ্টিতে এই অবতরণের ঘটনাটি ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাঁরা এটাকে হাজ্জের সুন্নত বলে গণ্য করতেন। কিন্তু আয়েশা রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে রসূল স. সেখানে ঘটনাক্রমে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং সেটা হাজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. রসূল স.-এর কাজ বা বক্তব্যের কারণ বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারার পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পিছনে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আর এটাও হয়েছে কোনো একটি বিষয় বা কথার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতায় মানুষে-মানুষে স্বাভাবিক পার্থক্য থাকার কারণে।
উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের হাদীস দুটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

হাদীস-১

খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরাইযা মুসলিমদের সাথে সন্ধি লঙ্ঘন করার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ স. সাহাবীদের আদেশ দেন যে- তোমরা দ্রুত প্রস্তুত হও, বনু কুরাইযাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এবং তিনি বললেন যে, তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযা পৌঁছার আগে সালাত আদায় না করে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি নিম্নরূপ–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . . . . . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ : لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের তৃতীয় ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী স. আহযাব যুদ্ধ হতে ফিরার

পথে আমাদেরকে বললেন– বনূ কুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসর সালাত আদায় না করে। কিন্তু রাস্তাতেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া)। নবী স.-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর ব্যাপারে কড়াকড়ি করেননি।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬০৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . . . . . عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি কুতায়বা রহ. থেকে শুনে তার সুনান গ্রন্থে লিখেছেন- ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (ইবনু উমারকে) রহম করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং ভুল বুঝেছেন। এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, যে ইয়াহুদী অবস্থায় মারা গিয়েছিল। (তাই) মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর তার জন্য তার পরিবারের লোকেরা কাঁদছে।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-১০২০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

৪. ভুলে যাওয়ার কারণে মতপার্থক্য

এটিও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ ছিল। আর এটি স্বাভাবিক। এর উদাহরণ হচ্ছে 'জামউল ফাওয়ায়িদে' উল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনাকৃত একটি হাদীস। ইবনে ওমর রা. বলতেন, 'রসূল স. একটা উমরা করেছেন রজব মাসে। এ বক্তব্য অবগত হয়ে হযরত আয়েশা রা. বললেন, ইবনে ওমর ব্যাপারটা ভুলে গেছেন।

৫. সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে মতপার্থক্য

কোনো বিধানের বৈপরীত্য নিরসন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ হচ্ছে– মুত'আ বিয়ে। রাসুল স. খাইবার যুদ্ধের সময় মুত'আ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আবার তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর আওতাস যুদ্ধের সময় আবার মুত'আ বিয়ের অনুমতি দেন। কিন্তু এবারও যুদ্ধের পর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মত হলো– প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মুত'আর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজন ও অবস্থার গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য অনুমতি স্থায়ী। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীর মত এর বিপরীত। তাদের মত হলো, মুত'আ বিয়ের অনুমতিটা ছিল মুবাহ পর্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রদ (মানসুখ) করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত বাস্তব কারণে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা নির্ণয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

সাহাবায়ে কিরামের পরের যুগে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের অবস্থা যা হয়

সুন্নাহ জানা, সুন্নাহর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নির্ণয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্য উত্তরাধিকার সূত্রে তাবেয়ী ও পরবর্তীদের যুগেও পৌঁছায় এবং তা আরও ব্যাপক হয়। পরবর্তীতে মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) দেখলেন আগে ইখতিলাফপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করা হয়নি। তা করলে তাদের ইজতিহাদসমূহ ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত (মাহফুজ) হতো। তাই মুজতাহিদগণ এ বিষয়ে মূলনীতি (উসূল) নির্ধারণ করে গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এ বিষয়ে (উসূলে ফিকহ) প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনিই 'উসূলে ফিকহ'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

এরপর 'উসূলে ফিকহ' নিয়ে অনেক চিন্তা-গবেষণা করা হয় এবং বর্তমানে যে ফিকহ শাস্ত্র আমাদের কাছে আছে তা পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের অনেক কষ্ট-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ফল। এটা তৈরি করে দিয়ে তারা উম্মাহর অনেক বড়ো খেদমত করেছেন। ঐ 'উসূলে ফিকহ'-এর ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ রসূল স.-এর হাদীস পর্যালোচনা করে বের করেছেন ইসলামী শরীয়ায় কোন আমল বেশি এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের বিধান।

{মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায় (আল আনসাফ ফী বায়ানী আসবাবিল ইখতিলাফ), মূল : শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ., অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ১৫-২৩}

আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগের যে বিশাল দুর্বলতা অতি সহজে ধরা যায়

প্রচলিত মতে ফরজ ও হারাম অস্বীকার করলে কাফির হয়। তবে ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মাকরূহ অস্বীকার করলে কাফির হয় না। কিন্তু এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনের কোনো একটি আয়াত এবং রসূলের স.-এর কোনো একটি সুন্নাহ তথা নির্ভুল হাদীস অস্বীকার করলে ব্যক্তি অবশ্যই কাফির হবে। কারণ কুরআনের কোনো একটি বক্তব্য অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর রসূল স.-এর কোনো একটি সুন্নাহ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে রসূল স.-কেই অস্বীকার করা। তাহলে ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মাকরূহ অস্বীকার করলে কাফির হবে না কেন? চিন্তার বিষয়, তাই না?

ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মাকরূহ অস্বীকার করলে কাফির না হওয়ার কারণ হলো– ঐ আমলগুলো রসূল স. করেছেন, বলেছেন বা অনুমোদন করেছেন কি না বা কী ধরনের গুরুত্ব দিয়ে করেছেন, বলেছেন বা অনুমোদন করেছেন সে বিষয়ে মনীষীগণ নিশ্চিত ছিলেন না। যে বিষয় সঠিক হওয়া নিশ্চিত নয় তার ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা সিদ্ধ নয়। কারণ, কাফির বলার অর্থ হলো নৈতিক ফাঁসি দেওয়া। তাই ফকীহগণ ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মাকরূহ অস্বীকারকারীকে কাফির বলেননি।

আমলের শ্রেণিবিভাগ নির্ণয়ের প্রচলিত নীতিমালার দুর্বলতা বিভিন্ন ধরনের আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে

১. ফরজ আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে

প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে যে আমলগুলো অপরিহার্য, অস্বীকার করলে কাফির হয় এবং পালন না করলে কবীরা গুনাহ হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে ফরজ। কিন্তু রসূল স. নিজে কোন আমলটি ফরজ, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নত বা কোনটি মুস্তাহাব তা সরাসরি বলেননি। তাই কোন আমলটি ফরজ বিভাগে পড়বে তা কেউ সহজে বলতে চাননি। কারণ, কাফির ঘোষণা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

তাই ১৪০০ বছর পরেও আজ ফরজ বিষয়গুলোর সঠিক এবং পরিপূর্ণ কোনো তালিকা মুসলিম জাতির সামনে উপস্থিত নেই। আর এই শূন্যস্থান পূরণ করেছে অদূরদর্শী লোক দিয়ে তৈরি করা ফরজ আমলগুলোর অগ্রহণযোগ্য তালিকা। ঐ তালিকার বদৌলতে আজ অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম জানে ইসলামে ফরজ আমল হচ্ছে ১৪০টি বা তার কিছু কম বা বেশি। আর ঐ ফরজ আমলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে– সালাতের ১৩টি, সিয়ামের ৬০টি (৩০ সিয়াম ও ৩০ নিয়াত), হজ্জের ৩টি, ওজুর ৪টি, গোসলের ৩টি ইত্যাদি।
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঐ ১৪০টি ফরজ হচ্ছে আল কুরআনে বর্ণিত ১৫ বা ২০টি মৌলিক বিষয় বা সেগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয় (আরকান-আহকাম)। ঐ অসতর্ক তালিকার বদৌলতে সাধারণ মুসলিমগণ প্রকৃত অর্থে মাত্র ১৫-২০টা কাজকেই ফরজ হিসেবে জানে এবং মানে। অথচ ইসলামে এর বাইরে অনেক ফরজ (মৌলিক) আমল আছে।

২. ওয়াজিব আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে

প্রচলিত মতে ওয়াজিব হলো ঐ বিষয়গুলো যা অস্বীকার করলে কাফির হয় না কিন্তু অনুসরণ না করলে কবীরা গুনাহ হয়। আর গুরুত্ব অনুযায়ী এর অবস্থান

দ্বিতীয় স্থানে। এ শর্ত পূরণ করে ওয়াজিব কাজগুলো বাছাই করাও প্রায় অসম্ভব কাজ। তাই ফরজ আমলের মতো ওয়াজিব আমলেরও কোনো সঠিক বা পরিপূর্ণ তালিকা মুসলিম জাতির সামনে আজও নেই। বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম বেতরের সালাত, ঈদের সালাত এবং সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতগুলোর ওয়াজিব রুকনগুলোকেই শুধু ওয়াজিব হিসেবে জানে।

৩. সুন্নাত আমলের তালিকায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে

রসূল স.-এর সুন্নাহর মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী যে আমলগুলোর অবস্থান তৃতীয় স্থানে প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তার নাম হলো সুন্নাত। ফরজ ও ওয়াজিব বিষয়গুলোর সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা না থাকা এবং তৃতীয় অবস্থানের সুন্নাহগুলোর নাম সুন্নাত রাখায় বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলাম পালনের ব্যাপারে অন্য এক মহা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান তালিকায় থাকা কয়েকটি ফরজ ও ওয়াজিব আমল বাদে অন্য সকল আমলকে সাধারণ মুসলিমরা সুন্নাত হিসেবে জানে। অর্থাৎ বর্তমান মুসলিমগণ প্রচলিত তালিকায় থাকা মাত্র কয়েকটি ফরজ ও ওয়াজিব আমলের পর গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে জানে, রসূল স.-এর সুন্নাহর গুরুত্ব অনুযায়ী তৃতীয় অবস্থানে থাকা আমলগুলোকে।

ঐ সুন্নাতের কয়েকটি হচ্ছে– সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতের সুন্নাত বিষয়গুলো এবং টুপি বা পাগড়ি মাথায় দেওয়া, মিষ্টি খাওয়া, মেসওয়াক করা, আতর মাখা, মাটিতে বসে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম, রসূল স.-এর সুন্নাহর গুরুত্বের দিক দিয়ে ১ নম্বর অবস্থানের অনেক সুন্নাহকে বাদ দিয়ে, ৩ নম্বর অবস্থানের সুন্নাহকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের দুনিয়ার জীবনে আজ যেমন শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এবং প্রগতি নেই, তেমনই তাদের আখিরাতের জীবনও ব্যর্থ হওয়ার বড়ো ধরনের আশঙ্কা রয়েছে।

আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তির মূল কারণ

আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নিয়ে ফকীহ/মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি আছে তা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি এবং বাস্তবে সকল মুসলিম তা দেখতেও পাচ্ছে। আমরা এটিও জেনেছি যে, এ বিভক্তি সাহাবী যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। আর যে সকল কারণে এ বিভক্তি ঘটেছিল সেটিও আমরা আলোচনা করেছি। তবে এ বিভক্তির মূল কারণ কী তা সকল মুসলিমের গভীরভাবে জানা দরকার। আর তা সঠিকভাবে জানতে পারলেই শুধু এ বিপর্যয়ের প্রতিকার করা সম্ভব হবে।

আমলের গুরুত্বভিত্তিক প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তির মূল কারণসমূহ হলো–

১. শ্রেণিবিভাগ করার সময় মানদণ্ড ধরা হয়েছে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে। আল কুরআনকে নয়।

২. রসূল স. নিজে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের বিষয়ে সরাসরি কোনো কথা বলে যাননি। মনীষীগণ রসূল স.-এর সুন্নাহ তথা প্রচলিত সহীহ হাদীস পর্যালোচনা করে শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

৩. প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের (বর্ণনা ধারা) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আর সনদের বিভ্রান্তি এত গভীর যে, ১৪০০ বছর পরেও মুসলিম মনীষীগণ (শায়খ আলবানী রহ., ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. প্রমুখ) প্রচলিত সহীহ হাদীসের সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে কাজ করছেন বা তাদের সেটি করতে হচ্ছে।

যে দুটি বিষয় জানা থাকলে আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করা সহজ হবে

বিষয় দুটি হলো–

ক. বিষয়বস্তুর আলোকে কুরআনে উল্লিখিত বিষয়সমূহের শ্রেণিবিভাগ।

খ. হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ।

ক. বিষয়বস্তুর আলোকে কুরআনে উল্লিখিত বিষয়সমূহের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আল কুরআনে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. মূল বিষয়

যে মূল বিষয়সমূহ নিয়ে আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো–

- কুরআন
- কুরআনের জ্ঞানার্জন
- সুন্নাহ
- Common sense
- দ্বীন প্রতিষ্ঠা
- আচার-ব্যবহার
- আইন ও বিচার
- সুদ
- ব্যাবসা-বাণিজ্য
- চুরি ও তার শাস্তি
- জিনা ও তার শাস্তি
- এতিমের দেখাশোনা
- দ্বীনের দাওয়াত
- তৌহিদ, রিসালাত, আখিরাত
- কুরআন, সুন্নাহ ও সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা
- পিতা-মাতা, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (তাহারাত)
- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকার ইত্যাদি উপাসনা
- অর্থ সম্পদ, আয় উপার্জন ও খরচ
- দান-সাদাকাহ
- যুদ্ধ-সন্ধি
- ইত্যাদি

পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়, এগুলো হলো এমন বিষয় যা মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে সফলকাম হওয়ার জন্য অপরিহার্য এবং প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

২. মূল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য

মূল বিষয়গুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাকারী বহু বক্তব্য কুরআনে আছে। তাই কুরআন বলেছে এবং মনীষীরা সকলে একমত যে, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন।

এ বিষয়ে কুরআনের অনেক বক্তব্যের একটি হলো–

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সংবলিত কিতাব যা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(সুরা আয-ঝুমার/৩৯ : ২৩)

৩. মূল বিষয়গুলো বুঝানো এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য প্রদত্ত উদাহরণ ও কাহিনি সংবলিত বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বহু উদাহরণ (আমছাল) উল্লেখ করেছেন। যে ধরনের উদাহরণ কুরআনে উল্লেখ আছে তা হলো– মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য ঘটনা এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনি। উদাহরণ সম্পর্কে কুরআনে থাকা অনেক বক্তব্যের একটি হলো–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহ তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী (বুঝাতে) চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) এ (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) এ (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়–

- কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য ছোটো-খাটো প্রাণীর উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

- মু'মিনদের প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে তাদের রবের কাছ থেকে আসা নির্ভুল শিক্ষার (কাত'য়ী দলিল) মর্যাদা দিতে হবে।
- যারা প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন জানা বা বুঝাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।
- প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় কুরআন বুঝতে না পেরে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়।
- প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করায় কুরআন বুঝতে পেরে অনেকে সঠিকপথ পায়।
- গুনাহগাররা ছাড়া আর কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে পথভ্রষ্ট হয় না।

৪. মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়নের নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) সংবলিত বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়নের মৌলিক আরকান-আহকাম বা নিয়ম-কানুনসমূহ কুরআনে আছে।

৫. মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পালন করা না করাকে উৎসাহিত ও নিরুৎসাহিত করামূলক বক্তব্য

মূল করণীয় বিষয়গুলো পালনকে উৎসাহিত করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পালন করাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নানা ধরনের লাভ ও ক্ষতিমূলক বক্তব্যও আল কুরআনে উল্লিখিত আছে। যেমন– মদ ও জুয়ার লাভ ও ক্ষতি উল্লেখ করা হয়েছে সুরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াতে।

৬. মূল বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের বিকল্প পদ্ধতির বর্ণনা সংবলিত বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো পালনের বিকল্প পদ্ধতি ধারণকারী বক্তব্যও কুরআনে আছে। যেমন–

তথ্য-১

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভালো। আর যদি গোপনে ও অভাবীদের দান করো তবে তা তোমাদের জন্য অধিক ভালো।

(সুরা বাকারা/২ : ২৭১)

ব্যাখ্যা : এখানে দান প্রকাশ্যে বা গোপনে দেওয়া উভয় পদ্ধতিকেই আল্লাহ অনুমোদন দিয়েছেন। তবে গোপনে দেওয়াকে অধিক ভালো বলেছেন।

তথ্য-২

সুরা শুরার ৩৯ ও ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ. وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

আর যারা তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না। (সুরা শুরা/৪২ : ৩৯, ৪০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যাচারিত বা আক্রান্ত হলে কী করণীয়, সে ব্যাপারে দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। প্রথমটি হচ্ছে– আক্রমণের অনুরূপ বা সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– ক্ষমা এবং আপস করা। অর্থাৎ ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হলে অবস্থা অনুযায়ী এ দুটি উপায়ের কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে।

৭. অমৌলিক বিষয় ধারণকারী বক্তব্য

ইসলামের একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় কুরআনে উল্লেখিত আছে। আর সেটি তাহাজ্জুদের সালাত। এটি রসূল স.-এর জন্য নফল (অতিরিক্ত ফরজ) ছিল বলে কুরআনে উল্লিখিত আছে। বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

আর (হে নবী) তা দিয়ে (কুরআন পাঠসহ) রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য (নফল)।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৯)

তাহলে দেখা যায়, কিছু মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে পুরো কুরআন আবর্তিত।

খ. হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

হাদীস শব্দটি কুরআনে বক্তব্য, বাণী, খবর, ঘটনা, স্বপ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন যেখানে হাদীস বলতে কারও বক্তব্য, বাণী বা কথা বুঝিয়েছে সেখানে এগুলোর হুবহু (রিওয়ায়েত বিল লফজ তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্ন ইত্যাদিসহ উল্লিখিত) রূপ তথা নির্ভুলরূপকে বুঝিয়েছে। তাই কুরআন যখন হাদীস শব্দটি দিয়ে রসূল স.-এর বক্তব্য, বাণী বা কথা বুঝিয়েছে তখন রসূল স.-এর ঐ সকল বিষয়ের হুবহু (রিওয়ায়েত বিল লফজ) তথা নির্ভুল রূপকে বুঝিয়েছে। আর তাই কুরআন অনুযায়ী রসূল স.-এর হাদীস হলো– রসূল স.-এর কথা, কাজ বা সমর্থনের হুবহু বা নির্ভুল রূপ।

হাদীস শাস্ত্রে হাদীস শব্দটিকে একটি পরিভাষা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। আর এর সংজ্ঞা ধরা হয়েছে– রসূল স. ও তাঁর পরের ৪ (চার) স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে-তাবে-তাবেয়ী) ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের কথা, কাজ বা অনুমোদন।

কারও কথা, কাজ বা অনুমোদন হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ (রিওয়ায়েত বিল লফজ) অন্যের উপস্থাপন করা (খুব ছোটো বিষয় ছাড়া) অসম্ভব। তাই অধিকাংশ হাদীস হলো ভাব প্রকাশ। আর এ অনুমোদন রসূল স. নিজেই দিয়েছেন। এ তথ্যের দলিল–

দলিল-১

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে– কোনো সাহাবীর একই বিষয়ে বলা বক্তব্য (মতন) সম্বলিত হাদীসের, একাধিক হাদীস গ্রন্থে থাকা বর্ণনা বা একটি হাদীস গ্রন্থে একই বিষয়ে বক্তব্য (মতন) সম্বলিত একাধিক রাবীর বলা বর্ণনায় শব্দের হুবহু মিল নেই। এ তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রচলিত হাদীসের প্রায় সবগুলো ভাব বর্ণনা।

দলিল-২

حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ . . . . . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن سُلَيْمَانَ بن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْنَا لَهُ: بِآبَائِنَا أَنْتَ، وَأُمَّهَاتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ، فَلا نَقْدِرُ أَنْ نُؤَدِّيَهُ كَمَا سَمِعْنَاهُ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلالا، وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى، فَلا بَأْسَ.

ইমাম আত-ত্বাবারানী রহ. ইয়াকূব ইবন আব্দুল্লাহ রহ.-এর বর্ণনা সনদের তৃতীয় ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল বাকী রহ. থেকে শুনে তার 'আল-মুজামুল কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন– ইয়াকূব ইবন আব্দিল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন উকাইমাহ আল-লাইসিয়্যু রহ. তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলাম অতঃপর বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বাবা-মা। আমরা আপনার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করি, কিন্তু যেভাবে শ্রবণ করি ঠিক সেভাবে বর্ণনা

করতে পারি না (শব্দে কিছু হের-ফের হয়ে যায়)। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন– যদি তোমরা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল (হিসেবে বর্ণনা) না করো এবং অর্থ (মূল ভাব/শিক্ষা) ঠিক থাকে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

- ♦ আত-ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস নং-৬৩৭২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– ভাব বর্ণনার মাধ্যমে হাদীস প্রচার করার অনুমতি রাসূল স. নিজেই দিয়েছেন। আর এটি না দিলে হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছাতো না।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের ভাব বর্ণনার বিষয়টি একাধিক প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তা'বেয়ী থেকে প্রমাণিত ও স্বীকৃত। এ সকল সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা., আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা., আবূ দারদা রা., আনাস ইবন মালিক রা., আমর ইবন দীনার রহ., আমির ইবন শা'বী রহ., ইবরাহীম আন-নাখয়ী রহ., সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ., (ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-ক্বাত্তান রহ., আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ ইবন উমাইর রহ., হাসান বসরী রহ. প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

(খতীব আল-বোগদাগী, আল-কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াত, পৃ. ১৭৪)

আর এই ভাব বর্ণনার কারণেই মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার পরে বলেন–

أو كما قال، ونحو هذا অর্থাৎ "নবী স. এমন এমন বা অনুরূপ বলেছেন।"

হাদীস শাস্ত্রে উল্লিখিত হাদীসের এই সংজ্ঞার দুর্বল দিকগুলো হলো–

১. ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি মুনাফিকও হতে পারে।
২. মানুষের বুঝের ভুল হতে পারে।
৩. নিজ শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপনের সময়ও ভুল হতে পারে।
৪. বর্ণনাকারীদের স্তরের সংখ্যা অধিক (চার) হওয়া।

এ দুর্বলতার সুযোগে বানানো বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের মাধ্যমে রসূল স. বলেননি এমন অনেক কথা রসূল স.-এর কথা তথা হাদীস হিসেবে চালু হয়ে যায়। ফলে ইসলামে ব্যাপক বিভ্রান্তি ঢুকে পড়ে। মিথ্যা বা ভুল হাদীসের ব্যাপকতা কী পরিমাণ ছিল তা সহজে বুঝা যায়, ইমাম বুখারীর রহ.-এর ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই করে পুনরোক্তি বাদ দিয়ে মাত্র দুই হাজার সাতশত সহীহ হাদীস পাওয়ার তথ্যটির মাধ্যমে।

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এটি বুঝতে পেরে হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ যাচাই করার জন্য আসমা-উর-রিজাল নামের এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীর তাকওয়া, পরহেজগারিতা, সত্যবাদিতা, স্মরণশক্তি, বিচক্ষণতা, পরিচিতি, বংশ ইত্যাদি দিক বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা সূত্রের (সনদ) ত্রুটিহীনতার ওপর ভিত্তি করে হাদীসকে সহীহ ও গায়রে সহীহ নামে ভাগ করেন।

মুহাদ্দিসগণ এটি জানতেন যে তাদের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না। তাই তারা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার জন্য হাদীসকে আবার ৪ (চার) ভাগে ভাগ করেন। যথা–

১. **মুতাওয়াতির হাদীস :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রতি স্তরে অসংখ্য তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়। এ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশত ভাগ।

২. **মশহুর হাদীস :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরে তিন জনের কম নয়। তাকে মশহুর হাদীস বলা হয়। এ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির হাদীসের চেয়ে কম।

৩. **আজিজ হাদীস :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরে দুই জনের কম নয়। আজিজ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর হদীসের চেয়ে কম।

৪. **গরীব হাদীস :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরে ১ (এক) জন তাকে গরীব হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে।

সুন্নাহ হলো রসূল স.-এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নির্ভুল রূপ। কিন্তু প্রচলিত 'হাদীস' শব্দটির অর্থ তা নয়। তাই 'সুন্নাহ' এবং হাদীস শাস্ত্রে উল্লিখিত 'হাদীস' শব্দের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাইতো হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী– সকল সুন্নাহ হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়।

ইসলামী আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করার সহজতম উপায়

Common Sense

Common Sense অনুযায়ী যেকোনো কর্মকাণ্ডের করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত থাকে–

ক. করণীয় বিষয়

১. **মৌলিক :** এগুলো হচ্ছে এমন করণীয় কাজ, যার একটিও বাদ পড়লে মূল কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। মৌলিক করণীয় কাজগুলো দুই স্তরে বিভক্ত থাকে। প্রথম স্তরের মৌলিক (মূল মৌলিক) এবং দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) কাজ। স্তরের পার্থক্য থাকলেও দুটি স্তরের কাজ না করার চূড়ান্ত ফল অভিন্ন। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হওয়া। প্রথম স্তরের একটি মৌলিক কাজ বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটি সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হয়। আর দ্বিতীয় স্তরের একটি মৌলিক কাজ বাদ গেলে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক কাজটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। ফলে মূল কর্মকাণ্ডটিও শতভাগ ব্যর্থ হয়। তবে এ ব্যর্থতা হলো পরোক্ষ।

২. **অমৌলিক :** এ বিষয়গুলো হচ্ছে এমন করণীয় কাজ যার সবগুলো বাদ পড়লেও মূল কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

খ. নিষিদ্ধ বিষয়

১. **মৌলিক :** এ হচ্ছে সে নিষিদ্ধ কাজ যার একটিও পালন করলে মূল কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। মৌলিক নিষিদ্ধ কাজগুলোও দুই স্তরে বিভক্ত থাকে। প্রথম স্তরের মৌলিক (মূল মৌলিক) নিষিদ্ধ কাজ এবং দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ (প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক কাজ)। স্তরের পার্থক্য থাকলেও দুটি স্তরের

নিষিদ্ধ কাজ করার চূড়ান্ত ফল অভিন্ন। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হওয়া। প্রথম স্তরের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করলে কর্মকাণ্ডটি সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হয়। আর দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজের সবগুলো পালন করা সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজটি সফল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। তাই মূল কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ করার জন্য এর প্রত্যেকটি অপরিহার্য। আর তাই এ ব্যর্থতা পরোক্ষ।

২. **অমৌলিক :** এ হচ্ছে সে নিষিদ্ধ কাজ যার সবগুলো পালন করলেও মূল কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

তাই Common Sense অনুযায়ী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নামক কর্মকাণ্ডের করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ/আমলগুলো গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত হবে–

ক. করণীয় কাজ/আমল

১. **মৌলিক :** এগুলো হবে ইসলামের সে করণীয় কাজ যার একটিও বাদ পড়লে একজন মু'মিনের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। মৌলিক করণীয় কাজগুলো দুই স্তরে বিভক্ত হবে। প্রথম স্তরের মৌলিক (মূল মৌলিক) এবং দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) কাজ। স্তরের পার্থক্য থাকলেও দুটি স্তরের কাজ না করার চূড়ান্ত ফল অভিন্ন। অর্থাৎ মু'মিনের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হওয়া। প্রথম স্তরের একটি মৌলিক কাজ বাদ গেলে মু'মিনের জীবন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হয়। আর দ্বিতীয় স্তরের একটি মৌলিক কাজ বাদ গেলে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক কাজটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। ফলে জীবনও শতভাগ ব্যর্থ হয়। তবে এ ব্যর্থতা পরোক্ষ।

৩. **অমৌলিক :** এগুলো হবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন করণীয় কাজ যার সবগুলো বাদ পড়লেও মু'মিনের জীবন ব্যর্থ হবে না, তবে তাতে কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

খ. নিষিদ্ধ কাজ

১. **মৌলিক :** এ হচ্ছে সে নিষিদ্ধ কাজ যার একটিও পালন করলে একজন মু'মিনের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। মৌলিক নিষিদ্ধ কাজগুলোও দুই স্তরে বিভক্ত হবে। প্রথম স্তরের মৌলিক (মূল মৌলিক) নিষিদ্ধ কাজ এবং দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ (প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়ের

বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক কাজ)। স্তরের পার্থক্য থাকলেও দুটি স্তরের নিষিদ্ধ কাজ করার চূড়ান্ত ফল অভিন্ন। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হওয়া। প্রথম স্তরের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করলে মু'মিনের জীবন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হয়। আর দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজের সবগুলো পালন করা সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজটি সফল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। তাই মূল কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ করার জন্য এর প্রত্যেকটি অপরিহার্য। আর তাই এ ব্যর্থতা পরোক্ষ।

২. **অমৌলিক :** এগুলো হবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন নিষিদ্ধ বিষয় যার সবগুলো পালন করলেও কোনো মু'মিনের জীবন ব্যর্থ হবে না, তবে তাতে কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস)

কুরআন ও হাদীসে করণীয় আমল বোঝাতে ফরজ, নফল ও মুস্তাহাব এবং নিষিদ্ধ আমল বোঝাতে হারাম ও মাকরূহ নাম উল্লিখিত আছে। অন্যদিকে ফরজ ও হারাম বিষয়ের একটিও ছেড়ে দেওয়া বা পালন করার পরিণতি এমন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যা দিয়ে বুঝা যায় মানুষের জীবন প্রত্যক্ষভাবে শতভাগ ব্যর্থ হবে। আর মুস্তাহাব ও মাকরূহ আমলগুলোর সবগুলোও ছেড়ে দেওয়া বা পালন না করার পরিণতি এমন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যা দিয়ে বুঝা যায় মানুষের জীবন ব্যর্থ হবে না, তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।
তাই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী–

১. মৌলিক করণীয় আমলের নাম হবে ফরজ এবং অমৌলিক করণীয় আমলের নাম হবে নফল/মুস্তাহাব।
২. মৌলিক করণীয় নিষিদ্ধ কাজের নাম হবে হারাম এবং অমৌলিক নিষিদ্ধ কাজের নাম হবে মাকরূহ।

মৌলিক আমলের তালিকা জানার সহজতম উপায়

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রধান তিনটি গ্রন্থ হলো– আল কুরআন, হাদীস ও ফিকহ। আমরা এখন জানার চেষ্টা করবো ইসলামের মৌলিক আমলের তালিকা সঠিকভাবে জানার সহজতম উপায় কী হবে? অর্থাৎ এ জন্য একজন মুসলিমকে কি সবগুলো গ্রন্থ পড়তে হবে, না যেকোনো একটি পড়লে চলবে? আর যদি একটি পড়লে চলে তবে সেটি কোনটি?

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

আল্লাহ তা'য়ালার কর্মপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ

কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণের বাস্তব কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মুখস্থ এবং লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা রসূল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। কিন্তু সুন্নাহর (হাদীস) ব্যাপারে ঐ ধরনের কোনো ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা নেননি। হাদীস প্রকৃত অর্থে লেখা হয়েছে রসূল স.-এর ইন্তেকালের প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর পরে ৫ থেকে ৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসার পর।

মৌলিক আমল হলো এমন বিষয় যার একটি বাদ গেলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হয়। তাই কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণের আল্লাহ তা'য়ালার কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজের তালিকা আল কুরআনে উপস্থিত আছে।

দৃষ্টিকোণ-২

ম্যানুয়ালের উদাহরণের দৃষ্টিকোণ

বর্তমানে সকল কোম্পানি তাদের বিক্রি করা জটিল যন্ত্রের সাথে একটি ম্যানুয়াল পাঠায়। ম্যানুয়ালে উপস্থিত থাকে যন্ত্রটির সকল মৌলিক অংশের নাম ও সকল মৌলিক পরিচালনা পদ্ধতি। অন্যদিকে অমৌলিক অংশের নাম ও পরিচালনা পদ্ধতি উপস্থিত থাকে না।

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ কর্তৃক মানুষের জন্য পাঠানো ম্যানুয়াল বা মূলগ্রন্থ হলো কুরআন। তাই এ উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনে উপস্থিত থাকার কথা ইসলামের সকল মৌলিক আমলের নাম ও তাদের মৌলিক বাস্তবায়ন পদ্ধতি। অন্যদিকে কুরআনে ইসলামের অমৌলিক আমলের নাম ও তাদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি উল্লেখ থাকার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ

কুরআন হলো ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। তাই কুরআনে যদি ইসলামের সকল মৌলিক আমল উল্লেখ থাকে তবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করাই হবে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজের তালিকা জানার একমাত্র নির্ভুল উপায়।

দৃষ্টিকোণ-৪

কলেবরের (Volume) দৃষ্টিকোণ

কুরআন, হাদীসগ্রন্থ ও ফিকহগ্রন্থের ভেতর কুরআনের কলেবর সবচেয়ে ছোটো। তাই কুরআনে যদি ইসলামের সকল মৌলিক আমল উল্লেখ থাকে তবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করাই হবে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজের তালিকা জানার সহজতম উপায়।

১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনে যদি ইসলামের সকল মৌলিক আমল উল্লেখ থাকে তবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করাই হবে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজের নির্ভুল তালিকা জানার সহজতম উপায়।

আল কুরআন

তথ্য-১

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

এটি সেই কিতাব। যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে কোনো সন্দেহ বা ভুল নেই। যে গ্রন্থে একটিও মৌলিক বিষয় অনুপস্থিত থাকে সে গ্রন্থকে কোনো বিষয়ের নির্ভুল গ্রন্থ অবশ্যই বলা যায় না।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) কাজের তালিকা কুরআনে উল্লেখ আছে। অন্যকথায়, যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ আমল নয়।

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন হলো সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড। যে গ্রন্থে কোনো বিষয়ের একটিও মৌলিক জ্ঞান অনুপস্থিত থাকে সে গ্রন্থকে ঐ বিষয়ের সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড অবশ্যই বলা যায় না।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) কাজের তালিকা কুরআনে উল্লেখ আছে। অন্যকথায়, যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ আমল নয়।

তথ্য-৩

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

নিশ্চয় আমরাই যিক্‌র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে নিজেকে কুরআনের সংরক্ষণকারী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনে যাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হতে পারে সে ব্যাপারে তিনি খেয়াল

রাখবেন। কিন্তু হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র সংরক্ষণের বিষয়ে এমন কোনো ঘোষণা আল্লাহ তা'য়ালা দেননি। কুরআনে ইসলামের সকল ফরজ ও হারাম বিষয় উপস্থিত আছে বলে মহান আল্লাহ এ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

তথ্য-৪.১

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

তথ্য-৪.২

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ

আমরা কিতাবে (কুরআন) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দুটি আয়াতে ইতিবাচক (Positive) এবং নেতিবাচক (Negative)-ভাবে উপস্থাপন করে মহান আল্লাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। তথ্যটি হলো– তিনি কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের সকল বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধু তাহাজ্জুদ সালাত বাদে ইসলামের কোন অমৌলিক আমলের কথা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই। আর তাহাজ্জুদ সালাত রাখার কারণ হলো– তাহাজ্জুদ সালাত রসূল স.-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ আমল ছিল।

তাই আয়াত দুটির মাধ্যমে কী তথ্য জানানো হয়েছে তা সকলের ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। সকল অমৌলিক আমল/কাজের কথা কুরআনে উল্লেখিত আছে। তবে তা সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে জানানো হয়নি। তা জানানো হয়েছে রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলা আয়াতগুলোর মাধ্যমে। যেমন–

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

আর তোমরা রসূলের আনুগত্য করো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৫৯)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

(সুরা আল হাশর/৫৯ : ৭)

রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার অর্থ হলো– তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা। আর রসূল স.-এর সুন্নাহর মধ্যে আছে ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক আমল/কাজ। তাই রসূল স.-এর সুন্নাহ জানলে ইসলামের সকল অমৌলিক আমল জানা হয়ে যাবে।

অন্যদিকে কুরআনে ইসলামের সকল অমৌলিক আমল/কাজ উল্লেখ থাকলে মানুষ ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক আমল/কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হতো। আর একটি মৌলিক আমল/কাজ বাদ রেখে সকল অমৌলিক আমল/কাজ পালন করলেও মানুষের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হতো। আবার কেউ যদি কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানতে ও মানতে চায় তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। কারণ, সে ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক আমল/কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হবে। এ বিষয়ে রসূল স.-এর হাদীস পরে আসছে।

তাই সহজেই বলা যায়– আলোচ্য দুটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজের নির্ভুল তালিকা কুরআনে উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ আমল নয়।

তথ্য-৫

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ . اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ .

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্য যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ওরাই তারা যারা

আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে জানা যায়– কুরআনের একটি বিষয়েও ঈমান না আনলে ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আয়াত দুটির বক্তব্য হলো কুরআনের একটি বিষয়ও না জানলে ও বিশ্বাস না করলে ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। এ অবস্থা শুধু মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে সত্য। তাই আয়াত দুটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে মূল বিষয়গুলো নিয়ে কুরআন আবর্তিত হয়েছে সেগুলো ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) আমল।

তথ্য-৬

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ ، فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

নিশ্চয় যারা হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর ফিরে যায়, শয়তান তাদের জন্য ঐ ধরনের আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটি এজন্য যে তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয় অস্বীকারকারীদের বলে– কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে, যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে? এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে অপছন্দ এবং অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে পছন্দ করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত চারটি থেকে জানা যায়– কুরআনের একটিও করণীয় আমল পালন না করলে বা নিষিদ্ধ বিষয় পালন করলে ব্যক্তি মানুষের সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ অবস্থা শুধু মৌলিক আমলের ব্যাপারে সত্য। তাই আয়াত দুটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে মূল বিষয়গুলো নিয়ে কুরআন আবর্তিত হয়েছে সেগুলো ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) আমল।

তাহলে দেখা যায়– ইসলামের মৌলিক আমলের তালিকা জানার সহজতম উপায়ের বিষয়ে প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম কাজের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তালিকা আল কুরআনে উল্লেখিত আছে।
২. যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই তা ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজ নয়।
৩. ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম কাজের নির্ভুল তালিকা জানার সহজতম উপায় কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবু সাঈদ আল খুদরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে, তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম রহ. বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে। তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি মাক্কী জীবনের হাদীস। মাদানী জীবনে রসূল স. হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসটি থেকে জানা যায় রসূলুল্লাহ স. মাক্কী জীবনে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। এমনকি কেউ হাদীস লিখলে তা মুছে ফেলতে বলেছেন। অথচ কুরআন, প্রথম থেকেই লেখা ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেন।

রসূল স.-এর প্রথম দিকে হাদীস লিখতে নিষেধ করার কারণ ছিল কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হতে না দেওয়া। আর তিনি এ নিষেধাজ্ঞা বলবত রেখেছিলেন, বক্তব্যের ধরন দেখে সাহাবীগণের কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বুঝতে পারার যোগ্যতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত। কারণ, কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হয়ে গেলে মুসলিমরা ফরজ ও হারাম এবং মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয় পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তাদের আমলে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। এর ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির তথ্যটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য রসূল স. আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা শুরু করেছেন। রসূল স. সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ স.-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে শোনা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস শোনা। আর রসূল স.-কে প্রেরণ করা হয়েছে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস।

তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসূল স.-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

'হাদীস' ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসূল স. যাদের সামনে এ কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরব ও সাহাবী। তাহলে রসূল স. কেন এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ, বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

রসূল স.-এর সময় হাদীস জানার একমাত্র উপায় ছিল শোনার মাধ্যমে জানা। সাহাবাগণ অধিকাংশ হাদীস জেনেছেন অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে শোনার মাধ্যমে। আর বর্তমান যুগের মুসলিমরা যে সকল গ্রন্থ পড়ে হাদীস জানছে তা হলো রসূল স.-এর কথার ৫-৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসা শোনা কথার লিপিবদ্ধ রূপ। আর হাদীস প্রকৃতভাবে লেখা হয়েছে রসূল স.-এর এন্তেকালের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর।

অন্যদিকে অধিকাংশ হাদীস হলো ভাব বর্ণনা। অর্থাৎ রসূল স.-এর কথা শোনার পর ব্যক্তি যা বুঝেছেন সেটি তার ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ভাব বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। আবার দুষ্ট লোকেরা বানানো সনদ (বর্ণনাসূত্র) জুড়ে দিয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি ইতিহাস স্বীকৃত।

তাই রসূল স.-এর এ হাদীসটি বলার দুটি প্রধান কারণ হলো–

১. মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) এবং অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (মুস্তাহাব ও মাকরূহ) আমল/কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার দরুন জীবন ব্যর্থ হওয়া।
২. অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা মৌলিক ভুল বা মিথ্যা হাদীস ধরতে না পারার দরুন জীবন ব্যর্থ হওয়া।

তাই হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . . . . . عَنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا

تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. হারেস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত। তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? তিনি বললেন– তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী রা. বললেন– আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন**। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং **স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী**, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ

সন্দেহে পতিত হয় না এবং **ধোঁকা খায় না**। তা দিয়ে আলেমদের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : বক্তব্যটির অর্থ এটি নয় যে– কুরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন হাদীস, ফিকহ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা যাবে না। কারণ, কুরআন ও রসূল স.-এর অন্য হাদীসে এ বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন করতে বলা হয়েছে। তাই এ কথার অর্থ হবে, অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করা যাবে, তবে সে জ্ঞানার্জন করতে হবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করার পরে বা সাথে সাথে। কারণ, কেউ যদি শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে, তবে সে–

- জীবনের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে সে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় আমল করবে। তাই তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।
- অন্যগ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য থাকলে সেটি সে বুঝতে বা ধরতে পারবে না।

তাই হাদীসটির এ অংশের আলোকে বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

'কুরআন স্থায়ী পথের দিকনির্দেশনা দানকারী' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : যে গ্রন্থে কোনো কর্মকাণ্ডের একটিও মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ কাজ অনুপস্থিত থাকে সে গ্রন্থকে ঐ কর্মকাণ্ডের স্থায়ী পথনির্দেশিকা বলা সঠিক কথা নয়। তাই হাদীসটির এ অংশের আলোকেও বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল

মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

'যা (কুরআন) দিয়ে ধোঁকা খায় না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : যে গ্রন্থে কোনো কর্মকাণ্ডের একটিও মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ কাজ অনুপস্থিত থাকে সে গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করলে মানুষ ধোঁকা খায় না বলা সঠিক কথা নয়। তাই হাদীসটির এ অংশের আলোকেও বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস-৪

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا .

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাপুরী রহ. আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মাহবূবী থেকে শুনে তাঁর 'মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– তোমরা কুরআনের জ্ঞানার্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও এবং তোমরা ফরজ (মৌলিক) বিষয়সমূহ শেখো ও মানুষকে শেখাও। কারণ আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। তারপর ভুল জ্ঞান/শিক্ষা প্রকাশ পাবে, এমনকি ফরজ (মৌলিক) বিষয়ে দু'জন মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না।

- আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং-৭৯৫০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তোমরা কুরআনের জ্ঞানার্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও এবং তোমরা ফরজ (মৌলিক) বিষয়সমূহ শেখো ও মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা ও

শিক্ষা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআন শিখতে ও শেখাতে হবে। কারণ, ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) কাজের তালিকা কুরআনে উপস্থিত আছে।

'আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : রসূল স.-এর এন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারীরা জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করে দেবে। ফলে সঠিক জ্ঞান হারিয়ে যাবে।

'এমনকি ফরজ (মৌলিক) বিষয়সমূহে মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের মাধ্যমে যা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো– রসূল স.-এর ওফাতের পর ফরজ ও হারাম বিষয়েও মতপার্থক্য ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, মানুষ কুরআন নয়, অন্যগ্রন্থ (হাদীস বা ফিকহ) পড়ে ইসলামের জ্ঞানার্জন করবে।

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন না। বস্তুত ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকেই মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সরাসরি কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক না থাকার কারণে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক হলো তারা, যারা আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত উৎসসমূহ (কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense) এবং সেগুলো ব্যবহারের প্রকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে ইসলাম তথা জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেছে।

'যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদের মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মানব শরীরে জ্ঞান থাকে মাথায়। অর্থাৎ মাথা হলো জ্ঞানের আধার। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং তা ব্যবহারের প্রকৃত নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) ব্যবহার করে শিক্ষিত হওয়া প্রকৃত জ্ঞানী থাকবে না তখন ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া ব্যক্তিদেরকে মানুষ মাথা তথা জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু আসলে তারা ভুল জ্ঞান ধারণকারী এবং অজ্ঞদের থেকেও ক্ষতিকর ব্যক্তি।

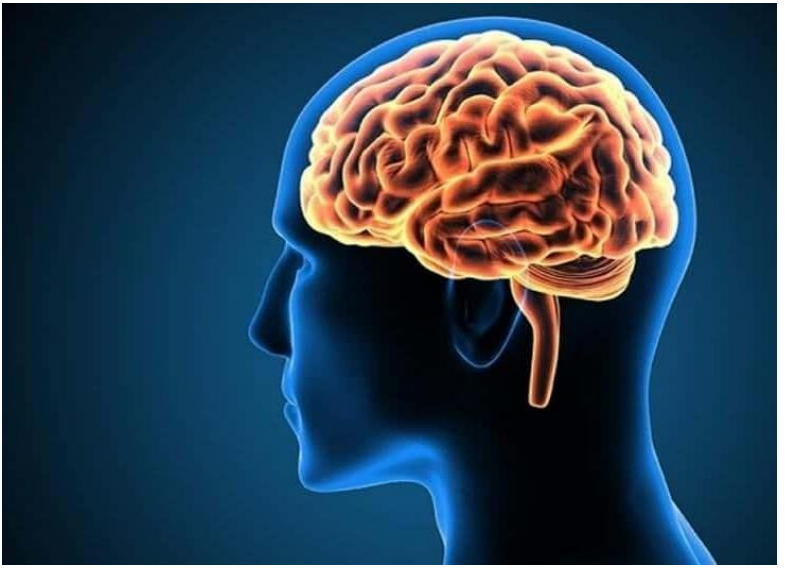

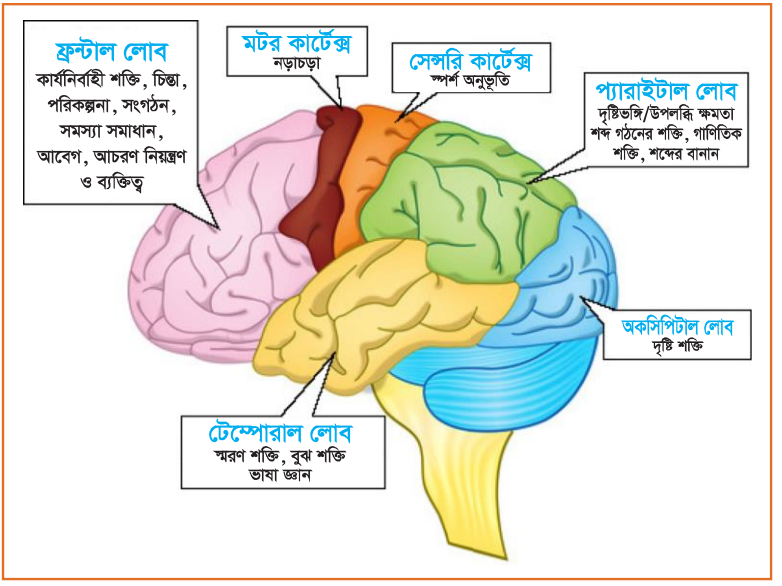

'তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া আলিম/জ্ঞানী খেতাবধারী ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে, সঠিক জ্ঞান না থাকার পরও তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে। অর্থাৎ তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

'অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে।

এটি তাদের দিয়ে দুইভাবে সংঘটিত হবে–

ক. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে।

খ. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

মানুষ অমৌলিক নয়, মৌলিক বিষয়ে ভুল থাকার কারণে পথভ্রষ্ট হয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল হাদীসের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

১. ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম কাজের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তালিকা আল কুরআনে উল্লেখিত আছে।

২. যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই, তা ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজ নয়।

৩. ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম কাজের নির্ভুল তালিকা জানার সহজতম উপায় হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

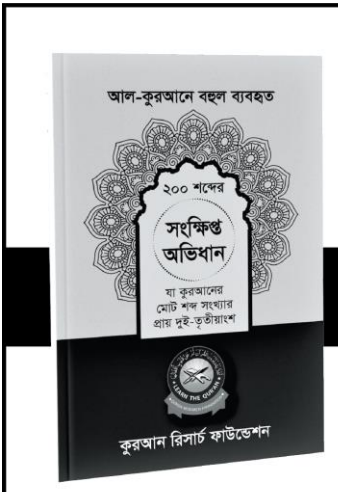

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান
যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ
কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

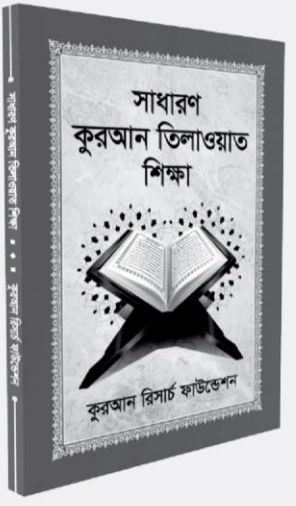

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত
সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

কুরআন থেকে মৌলিক করণীয় (ফরজ) আমল খুঁজে বের করার পদ্ধতিসমূহ

কুরআন থেকে ইসলামের মৌলিক করণীয় (ফরজ) আমল খুঁজে বের করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যত বেশি সংখ্যক পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ করা যাবে সিদ্ধান্তটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। মূল মৌলিক এবং মূল মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক আমল খুঁজে বের করার পদ্ধতি অভিন্ন। পদ্ধতিগুলো হলো–

পদ্ধতি-১

আদেশমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টি পালন করার কথাটি উল্লেখ থাকা।

যেমন–

তথ্য-১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

পড়ো (জ্ঞানার্জন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১)

ব্যাখ্যা : এখানে পড়া তথা জ্ঞানার্জন করার কথাটি আদেশ আকারে বলা হয়েছে। তাই পড়া তথা জ্ঞানার্জন করা ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় আমল তথা ফরজ কাজ।

তথ্য-২

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো। সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আল 'আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : এখানে সালাত কায়েম করা কথাটি আদেশ আকারে এসেছে। তাই সালাত কায়েম করা ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় তথা ফরজ আমল।

পদ্ধতি-২

লিখে দেওয়া হয়েছে, ফরজ করা হয়েছে এমন ধরনের কথা, পালন করতে বলা বিষয়টির সাথে যুক্ত থাকা। যেমন–

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম লিখে (নির্ধারণ করে) দেওয়া হলো, যেমন তা লিখে দেওয়া হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতন মানুষ হতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : এখানে সিয়ামকে 'লিখে দেওয়া হয়েছে' কথাটি বলা হয়েছে। তাই সিয়াম পালন করা ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় তথা ফরজ আমল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান লিখে (নির্ধারণ করে) দেওয়া হলো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে কিসাস মু'মিনদের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে। তাই কিসাসের বিধান চালু করা ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় তথা ফরজ কাজ।

তথ্য-২

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

সদাকা (যাকাত) কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট (যাকাত সংশ্লিষ্ট) কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, ঘাড় আটকানোদের (যেকোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তির) জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। এটা (এই বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ফরজ বিধান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। (সুরা আত তাওবা/৯ : ৬০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে যাকাতকে 'ফরজ' বলা হয়েছে। তাই যাকাত দেওয়া ইসলামের একটি প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় তথা ফরজ বিষয়।

তথ্য-৩

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ....

একটি সুরা, এটি আমরা অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরজ করেছি, আর এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। জেনাকারিণী ও জেনাকারীর প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো, ... ।

(সুরা আন নূর/২৪ : ১ ও ২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে জেনার শাস্তির বিধানকে ফরজ করার কথা বলা হয়েছে। তাই জেনার শাস্তির বিধান চালু করা ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় তথা ফরজ কাজ।

পদ্ধতি-৩

বিষয়টি পালন করলে জান্নাত পাওয়া যাবে এমন ঘোষণা থাকা। যেমন–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

যদি তোমরা বড়ো বড়ো নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ (কবীরা গুনাহসমূহ) থেকে বিরত থাকো তাহলে আমরা তোমাদের ছোটো ছোটো পাপগুলো মোচন করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (বেহেশত) প্রবেশ করাবো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে কবীরা গুনাহসমূহ থেকে মুক্ত থাকতে পারলে বেহেশতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় তথা ফরজ বিষয়।

কুরআন থেকে মৌলিক নিষিদ্ধ (হারাম) কাজ খুঁজে বের করার পদ্ধতিসমূহ

কুরআন থেকে ইসলামের মৌলিক নিষিদ্ধ (হারাম) আমল খুঁজে বের করারও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এখানেও যত বেশি সংখ্যক পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ করা যাবে সিদ্ধান্তটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। মূল নিষিদ্ধ কাজ এবং তা সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক কাজ খুঁজে বের করার পদ্ধতি অভিন্ন। পদ্ধতিগুলো হলো–

পদ্ধতি-১

নিষেধাজ্ঞামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টি থেকে দূরে থাকতে বলা। যেমন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

আর তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকো না এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৪২)

ব্যাখ্যা : এখানে নিষেধাজ্ঞামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। তাই সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করা ইসলামের দুটি মৌলিক নিষিদ্ধ তথা হারাম কাজ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

আর জেনার ধারে কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট (বিভিন্ন কঠিন রোগ সৃষ্টিকারী) পথ।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৩২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে নিষেধাজ্ঞামূলক বক্তব্য দিয়ে জেনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই জেনা ইসলামের প্রথম স্তরের নিষিদ্ধ তথা হারাম কাজ।

পদ্ধতি-২

'হারাম করা হয়েছে' কথার মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয়টি পালন করা থেকে দূরে থাকতে বলা। যেমন–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

(সুরা আল বাকারা /২ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে 'হারাম করা হয়েছে' বক্তব্যের মাধ্যমে মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এমন বিষয় খাওয়া থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। তাই মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এমন জিনিস খাওয়া ইসলামের ৪টি মৌলিক নিষিদ্ধ তথা হারাম কাজ।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের এমন কিছু বলা যা (সত্য কি না তা নিশ্চিতভাবে) তোমরা জানো না।

(সুরা আল আরাফ/৭ : ৩৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে 'হারাম করা হয়েছে' বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা নির্ভুল কি না তা জানা নেই, এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। তাই প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকা বিষয়গুলো ইসলামের মৌলিক নিষিদ্ধ তথা হারাম কাজ।

পদ্ধতি-৩

বিষয়টি পালন করলে সরাসরি জাহান্নামে যাওয়ার ঘোষণা থাকা। যেমন–

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

... ... অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম; অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে, সে আগে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), আর তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দুটির মাধ্যমে জানা যায়– সুদ খাওয়া হারাম জানার পরও যারা সুদ খায় তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই সুদ খাওয়া ইসলামের মৌলিক নিষিদ্ধ তথা হারাম আমল।

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দুটির মাধ্যমে জানা যায়– যারা মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই মিরাস যথাযথভাবে বণ্টন না করা ইসলামের মৌলিক নিষিদ্ধ তথা হারাম আমল।

পদ্ধতি-৪

বিষয়টি পালন করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন বা লা'নত করেন এ ধরনের বক্তব্য থাকা। যেমন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বিষয়াদি ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা (জানার পর) তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনে উল্লেখ থাকা বক্তব্য জানার পর যারা তা গোপন করবে তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তাই

কুরআনে উল্লেখ থাকা বক্তব্য জানার পর গোপন করা ইসলামের একটি নিষিদ্ধ তথা হারাম আমল।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কেন তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) কর না? আল্লাহর কাছে এটি একটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয় যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা (বাস্তবে) পালন করো না।

(সুরা আস সফ/৬১ : ২ ও ৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– মুখে যা বলা হয় কাজে তা প্রকাশ না পাওয়া আল্লাহর কাছে একটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয়। তাই মুখে যা বলা হয় কাজে তা প্রকাশ না পাওয়া ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ তথা হারাম আমল।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

অমৌলিক করণীয় (মুস্তাহাব) ও নিষিদ্ধ (মাকরূহ) আমলের তালিকা জানার উপায়

নফল/মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয়গুলোর বৈশিষ্ট্য হলো– এর সবগুলো বাদ গেলে বা পালন করলেও মুসলিম জীবন ব্যর্থ হয় না তবে তাতে কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকবে।

Common sense

বর্তমানে সকল কোম্পানী তাদের বিক্রি করা জটিল যন্ত্রের সাথে পাঠায়-ম্যানুয়াল ও ভোক্তাদের যন্ত্রটি চালিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার ভোক্তাদেরকে যন্ত্রটি চালিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার সময় ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো দেখানোর সাথে সাথে খুঁটিনাটি (অমৌলিক) অনেক বিষয়ও দেখিয়ে দেয়। তবে সে বিষয়গুলো ম্যানুয়ালে উপস্থিত থাকা কোনো বিষয়ের বিপরীত হয় না। খুঁটিনাটি (অমৌলিক) বিষয়গুলো যন্ত্রটিকে নিখুঁতভাবে চালাতে সহায়তা করে।

মহান আল্লাহও মানুষরূপী অত্যন্ত জটিল সৃষ্টি দুনিয়ায় পাঠানোর সাথে পাঠিয়েছেন– ম্যানুয়াল তথা কিতাব এবং মানুষদের কিতাবের বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রসূল (আ.)। নবী-রসূলগণ মানুষকে কিতাবের বিষয় বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেওয়ার সময় মুস্তাহাব (খুঁটিনাটি) অনেক বিষয়ও বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেয়। ঐ খুঁটিনাটি তথা মুস্তাহাব বিষয়গুলো মানব জীবনকে নিখুঁতভাবে চালাতে সহায়তা করে। তবে ঐ খুঁটিনাটি তথা মুস্তাহাব বিষয়গুলো কিতাবের কোনো বিষয়ের বিপরীত হতে পারবে না।

তাই সহজে বলা যায় সুন্নাহ বা নির্ভুল হাদীসে–

১. সকল নফল/মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয় উপস্থিত আছে।
২. মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয়ের কোনোটিও কুরআনের কোনো বক্তব্যের বিপরীত হতে পারবে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসূল স. হলেন আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের (ম্যানুয়াল) ব্যাখ্যাকারী। তাই কুরআনের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করার জন্য রসূল স. কুরআনের অতিরিক্ত কিছু কথা বলেছেন, করেছেন বা সমর্থন করেছেন। এ গুলোই হলো মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয়।

তথ্য-২

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.

আর সে যদি আমার সম্পর্কে কোনো কথা বানিয়ে বলতো, অবশ্যই আমি তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম (শক্ত করে ধরে ফেলতাম)। অতঃপর অবশ্যই আমি তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই, যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতো।

(সুরা আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয় সম্পর্কে কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন কখনও রসূল স.-এর হাদীস হতে পারে না।

তথ্য-৩

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে (ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্ণ করলাম ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াত নাযিলের পর রসূল স. মাত্র ৮১ দিন জীবিত ছিলেন।

আয়াতটির বক্তব্য হলো– এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আয়াতটি অনুযায়ী বলা যায়– ইসলামের সকল মুস্তাহাব ও মাকরূহ কাজ অবশ্যই হাদীসে আছে। অন্যকথায়, আয়াতটি অনুযায়ী হাদীসের বাইরের আমল ইসলামের মুস্তাহাব ও মাকরূহ আমল হতে পারে না।

নির্ভুল হাদীসে ফরজ ও হারাম বিষয়ের বাইরে যে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় উপস্থিত আছে সেগুলো হবে নফল/মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয়। তাই হাদীসগ্রন্থ পড়লে এগুলো জানা ও বের করা যাবে।

শেষ কথা

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে তাহলে এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়– আমলের গুরুত্বের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ এবং মৌলিক আমলের তালিকা জানতে হলে কুরআনের জ্ঞান অপরিহার্য। অর্থাৎ ইসলামী জীবনবিধান অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে হলে যে বিষয়টি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কুরআনের জ্ঞান। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে সকল মুসলমানের জন্য সব থেকে বড়ো সওয়াবের কাজ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা। আর ইবলিস শয়তানের সব থেকে বড়ো কাজ কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অর্থাৎ সব গুনাহের বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি **'মুমিনের ১ নম্বর কাজ এবং শয়তানের ১ নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের অবস্থা দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইবলিস শয়তান তার প্রথম ও প্রধান কাজের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকমভাবে সফল হয়েছে। শয়তান এ কাজটি করেছে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিটি স্তরে সুকৌশলে বাধা সৃষ্টি করে। ইবলিস তার প্রথম ও প্রধান কাজে সফলকাম হওয়ার চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, একটি জাতির অধিকাংশ সদস্য, ইবলিস শয়তানের সেই ধোঁকাগুলোকে কল্যাণকর (সওয়াব) কথা ভেবে ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে এবং তার ওপর আমল করে যাচ্ছে। ধাপ অনুযায়ী ইবলিস শয়তানের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথা বা কাজগুলো হচ্ছে–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জনকে নিরুৎসাহিত করা

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইবলিস শয়তানের কাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে এটি। যে সকল কাজ বা কথার মাধ্যমে ইবলিস শয়তান এটা করেছে তা হলো–

- কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মুমিনের প্রথম ও প্রধান কাজ অর্থাৎ সব থেকে বড়ো সওয়াবের কাজ এবং তা না করা সকল মুমিনের সবচেয়ে বড়ো গুনাহের কাজ– এই সত্য তথ্যটা মুসলিমদের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইবলিস শয়তান অবিশ্বাস্য রকমভাবে সফল হয়েছে।
- কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন এবং বুঝার চেষ্টা করলে গুমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই কুরআন না বুঝে পড়াই ভালো। কুরআন, হাদীস ও Common sense বিরোধী এ কথাটিও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ।
- জ্ঞানের থেকে আমলের গুরুত্ব বেশি। কুরআন, হাদীস ও Common sense বিরোধী এ কথাটিও বহুল প্রচারিত।
- জানার পর পালন না করা, না জানার কারণে পালন না করার চেয়ে বেশি শাস্তি। কুরআন, হাদীস ও Common sense পরিপন্থি এ কথাটিও বহুল প্রচারিত।

  (বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বোল্লিখিত বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।)

২. জীবনের বেশিরভাগ সময় মানুষ যেন কুরআন ধরে পড়তে না পারে সে ব্যবস্থা করা

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে ইবলিস শয়তানের প্রথম বাধাকে উপেক্ষা করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে এগুতে চায়, তারা যাতে ইচ্ছা করলেই কুরআন ধরে পড়তে না পারে সে জন্য ইবলিস শয়তান ধোঁকাবাজি করে মুসলিম সমাজে যে কথাটা চালু করে দিয়েছে তা হচ্ছে– ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা পাপ। আর বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা কথাটা ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে। জাগ্রত অবস্থায় বেশির ভাগ সময় একজন মুসলিমের ওজু থাকে না। তাই কথাটার প্রভাবে ইচ্ছা থাকলেও জাগ্রত অবস্থায় বেশিরভাগ সময় মুসলিমগণ কুরআন ধরে পড়তে পারে না। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে এ কথাটাও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপের কাজ এমন কোনো কথা কুরআন ও হাদীসে নেই।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৪) শিরোনামের বইটিতে।

৩. কুরআন পড়েও মুসলিমরা যেন তার জ্ঞানার্জন করতে না পারে সে ব্যবস্থা করা

ধোঁকাবাজির প্রথম দুটি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় ইবলিস শয়তান তাদেরকে আর এক অভিনব ধোঁকাবাজিমূলক কথার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে। সে কথাটি হচ্ছে 'অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী'। কথাটি অর্থছাড়া কুরআন পড়াকে শুধু অনুমতিই দেয় না, তা দারুণভাবে উৎসাহিতও করে।

এই কথাটার প্রভাবে সারা বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম আজ বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন খতম দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। কারণ, অর্থসহ বা বুঝে পড়তে গেলে অর্থছাড়া পড়ার চেয়ে একই সময়ে কম অক্ষর পড়া হবে আর তাই সওয়াবও কম হবে। কথাটির ফলে কুরআন পড়েও মুসলিম জাতী কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। অর্থাৎ কথাটি শয়তানের ১ নম্বর কাজকে সফল করতে দারুণভাবে সাহায্য করছে। অথচ ঐ রকম কোনো কথা কুরআন বা হাদীসের কোথাও নেই বরং তথায় এর উল্টো অনেক কথা আছে।

বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটিতে।

৪. কুরআন জানার পর মুসলিমরা যাতে তার সকল বিষয়ে আমল করতে অগ্রসর না হয়, তার ব্যবস্থা করা

ওপরের তিনটি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে শুরু করে তারা যাতে আল কুরআনের সকল বিষয়ের ওপর আমল করতে অগ্রসর না হয়, ইবলিস শয়তান সে চেষ্টা করেছে। কারণ ইবলিস জানে, কুরআনের কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে মুসলিমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্য সে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে অনেক মুসলিমদের এ কথা বিশ্বাস বা গ্রহণ করিয়েছে যে– আল কুরআনের কিছু কিছু বক্তব্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি জাতির জন্য প্রযোজ্য, মুসলিমদের জন্য নয় বা আল কুরআনের কিছু আয়াতের তেলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই (নাসিখ-মানসুখ)। প্রচারণা দুটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য থেকে মুসলিমদের

শিক্ষা নেওয়ার আছে। তা না থাকলে মহান আল্লাহ ঐ বক্তব্যগুলো কাগজের পাতায় লেখার মাধ্যমে তার সৃষ্টির কাগজ ও কালি রূপের অপরিসীম সম্পদ এবং তা পড়া ফরজ করিয়ে দিয়ে মানুষের অপরিসীম সময়ও নষ্ট করতেন না। কারণ, মহান আল্লাহ নিজেই আল-কুরআনের মাধ্যমে (বনী ইসরাইল : ২৭) জানিয়ে দিয়েছেন, 'সম্পদ ও সময়ের অপচয়কারী শয়তানের ভাই'।

সবশেষে চলুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন মুসলিম জাতির সবাইকে সব ফরজের বড়ো ফরজটি পালন করার তৌফিক দান করেন। যে মুসলিম তা করতে পারবেন তিনিই কেবল জানতে, বুঝতে ও খুঁজে বের করতে পারবেন ইসলামের মৌলিক আমল কোনগুলো আর অমৌলিক আমল কোনগুলো। ফলে তিনিই কেবল সক্ষম হবেন মৌলিক আমল বাদ না দিয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনা করতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হতে।

পুস্তিকায় কোনো ভুল ধরা পড়লে গঠনমূলকভাবে আমাদের জানিয়ে দেওয়া পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনীগুলো ছাপানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

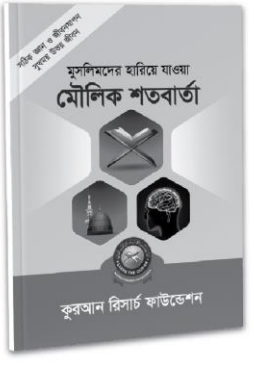

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য